**শ্রীচরেণেষু দাদা**

**পর্ব তিন**

বাংলাদেশে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন শুভ্র খুব ছোট।

তাদের গ্রামের বাড়ী এমনই ছিল যে মাথার উপরে একটা ছাদও ছিল না। বাবা ছিলেন একজন গরীব কৃষক। অন্যের ক্ষেতে মজুরী খাটতেন। দিনরাত মেহনত করেও পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারতেন না। তার জীবন ছিল চিরকালীন সংগ্রামের। অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও দারিদ্র্যের বোঝা তার কাঁধে চেপে থাকত।

শুভ্রের জন্মের আগেই দাদু-দিদা পরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। বাবারাও ছিলেন পাঁচ ভাই, কিন্তু দুই জ্যাঠুকে শুভ্র কোনোদিন দেখেনি—শোনা যায়, তারা খুব অল্প বয়সেই পৃথিবী ছাড়েন। শুভ্র জানে না তাদের পরিবারের কেউ আর আছে কিনা, তবে এক জ্যাঠিমা কলকাতায় থাকতেন, সেটাও সে দাদার কাছ থেকেই জেনেছে। পরিবারের সেই শূন্যতা শুভ্রের শৈশবে যেন এক নিঃশব্দ বেদনার ছায়া হয়ে ছিল, যা সে কখনো পূরণ করতে পারেনি।

বাবার ভাগ্য যেন চিরকাল তার সাথে নিষ্ঠুর খেলাই খেলেছে। দুই কাকা তাকে জমি-জায়গা তো দূরের কথা, ন্যায্য অধিকারও দেয়নি। ফসলী জমিগুলো কৌশলে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, আর বাবার জন্য রেখে যায় শুধুই শূন্যতা। যুদ্ধের পর যখন গ্রামে ফিরে আসে, তখন মাথা গোঁজার মতো নিজের বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। শেষমেশ, ছোট কাকার এক পরিত্যক্ত, ভাঙাচোরা ছোট ঘরেই ঠাঁই হয়—একটি ঘর, যা যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই নড়বড়ে, শীতল ঘরেই বাবা, মা আর ছোট ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে শুভ্রদের জীবন কোনো রকমে টেনে নিতে হত। অরুণ পরিবারের সবার বড়ো, তাই তার কাঁধেই এসে পড়েছিল পর্বতের মতো বিশাল দায়িত্বের বোঝা। অভাবের সেই দিনগুলো যেন অন্তহীন এক দুঃস্বপ্নের মতো, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল যন্ত্রণার। প্রতিটি নিশ্বাস যেন বয়ে আনত নতুন কষ্ট। আজও সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে হলে অরুনের হৃদয় ভেঙে যায়, চোখে জল এসে যায়—একটি জীবনের যা কিছু আনন্দ হতে পারত, তা যেন দুঃখের অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে।

যুদ্ধের কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখনো শুভ্রের জন্ম হয়নি। শুভ্রের বড় ভাই অরুণ তখন হাইস্কুলে পড়তো। কিন্তু বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার অভাব এবং পড়াশুনার অসুবিধার কারণে, বাবা তাকে একই গ্রামে বড় বোন সুস্মিতাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। সুস্মিতা ও তার স্বামীর সংসার ছিল সচ্ছল। জামাই ছিলেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, এলাকায় তার হাক-ডাক ছিল। সেখানে অরুন অন্তত দুবেলা ঠিকমতো খেতে পেতো এবং পড়াশুনার জন্যও অন্তত একটা সুবিধাজনক পরিবেশ ছিল। একদিকে পড়াশুনা আর বাকী সময়টা দিদির সংসারে-এই ভাবেই চলছিল বড়দাদার জীবন।

কিন্তু শুভ্রের আরেক দাদা সুবীরের ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। দারিদ্র্যের কারণে বাবার পক্ষে সুবীরকে ঠিকমতো খাওয়ানো বা পড়ানো সম্ভব হয়নি। সে মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়তে পেরেছিল, তারপর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তার স্বভাবও একটু আলাদা। ছিল একটু দুষ্ট প্রকৃতির। পড়াশোনার প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। প্রতিদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় তার মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিত। পড়তে বসতে বললেই নানা অজুহাতে পড়াশোনা এড়িয়ে যেত। তার ভালো লাগত আজে বাজে গ্রামের বখাটেদের সাথে সময় কাটানো এবং দুষ্টুমি করা। মা-বাবা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকলেও, সুবীরের মনে কোনো উদ্বেগ ছিল না। সে বাড়িতে এবং বাইরে সবসময়ই সমস্যার সৃষ্টি করত। এসব মা-বাবাকে ভীষণ বিব্রত ও ক্লান্ত করে তুলত। একদিকে সংসারে অচল অবস্থা অন্যদিকে সুবীরের বাদরামী আর অশান্তির কারনে একদিন বাবা তাকে গ্রামের বাজারের এক চায়ের দোকানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অন্তত সেখানে দুবেলা খাবার জুটবে। কাজে থাকলে মনটা বসবে। গরীবের আবার পড়াশুনা কী?

সুবীরের বয়স তখন কতই বা হবে? ১১-১২ বছরের একটি বাড়ন্ত শিশু। জীবন সম্পর্কে ধারণাগুলো তখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু সুবীর জানে যে তাদের পরিবারটা ছিল একেবারে নিঃস্ব। গ্রামের ছোট্ট কুঁড়েঘরে তারা কোনোরকমে বেঁচে আছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত, কিন্তু একবারও ভাতের স্বাদ পেত না। ভাত যেন ছিল বিলাসিতা। প্রায় প্রতিদিনের খাবার বলতে ময়দা আর জল মিশিয়ে তৈরি একটা সাদাসিধে পান্তা। পেট ভরানোর জন্য সেই সামান্য খাবারটুকুই ছিল তাদের অবলম্বন। বাড়ির অবস্থা এমনই যে, কেরোসিন কেনার সামর্থ্যও ছিল না। তাই সন্ধ্যা নামলেই তাদের ঘরটা ডুবে যেত ঘোর অন্ধকারে। হারিকেনের আলো তো দূরের কথা, একটা মোমবাতি জ্বালানোর সামর্থ্যও ছিল না। মায়ের মুখে সবসময় চিন্তার ছাপ, বাবার মুখটা যেন ক্রমশ ভারী হয়ে উঠত সেই দুঃখের ভারে। তবুও, তারা নিরবে এই কষ্টের দিনগুলো পার করছিল, কোনো অভিযোগ ছিল না তাদের। কিন্তু এভাবে আর যেন চলছিল না।

সুবীর খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল, তার পরিবারের অসহায় অবস্থার কতটা গভীরে তারা ডুবে আছে। তবে, যখন বাবার মুখে শুনল যে তাকে চায়ের দোকানে কাজ করতে যেতে হবে, তখন তার ভেতরে যেন একটা ঝড় বইতে শুরু করল। প্রথমে মনে হলো, হয়তো বাবা রাগের মাথায় এসব বলছেন। কিন্তু যখন টের পেল যে এটাই বাস্তব, তখন যেন দুনিয়াটাই থমকে গেল তার কাছে। মুখে কিছু বলতে পারল না, কারণ কিছু বলার মতো শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট ছিল না।

সে ভাবল, হয়তো দোকানে কাজ করলে অন্তত দুটো ভাত জুটবে। আর বাবা-মায়ের কষ্টটাও কিছুটা কমবে। কিন্তু এই ভাবনাগুলো তার ছোট্ট মনকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারল না। তার ভিতরটা ভেঙে পড়ছিল এই ভেবে, যে এই বয়সে, যখন তার বই হাতে স্কুলে যাওয়ার কথা, বন্ধুদের সাথে মাঠে হাসিখুশি খেলাধুলা করার কথা, তখন তাকে অন্যদের জন্য চায়ের কাপে চামচ নাড়তে হবে। তার শৈশবের স্বপ্নগুলো যেন চোখের সামনেই একে একে নিভে যাচ্ছিল। আর সেই নিভু নিভু আলো তাকে আরো বেশি অসহায় করে তুলছিল।

চায়ের দোকানের মালিক, হারু মিয়া, সুবীরকে যেদিন প্রথমে দেখেন তার একটু মায়া হলো। হারু মিয়া নিজেও এক সময় খুব গরীব ছিলেন। মাঝে মাঝে রাধে শ্যাম, অর্থাৎ শুভ্রের বাবা, এসে বসতো হারুর চায়ের দোকানে। সপ্তাহে দুই দিন, মঙ্গলবার আর শনিবার, এলাকার বাজার জমজমাট হয়ে উঠতো। যদিও কেনার সামর্থ্য তেমন ছিল না, তবুও জীবিকার তাগিদে যা কিছু জোটে, তা নিয়েই শেষমেশ বাজারের মুখ দেখাতো রাধে। বাজার শেষে ফেরার আগে হারুর দোকানে এসে একটু বিশ্রাম নিত। দোকানের সামনের ছোট্ট টুলে বসে হাঁক ছাড়তো—

“হারু, তোর হুকোটারে একটু দে তো।”

হারু তখন চোখ তুলে জর্দা মাখা লাল জিহ্বা নাড়াতে নাড়াতে ফোকলা দাঁত বের করে হাসত—

“কি খবর রাধে? বস, বস, দিচ্ছি। আগে একটু চা খেয়ে নে।”

হারু জানত, রাধে শ্যামের চা খাওয়ার মতো পয়সা নেই। তবু, যখনই সে আসত, হারু হুকো দেওয়ার আগে এক কাপ ভালো করে বানানো দুধের চা তুলে দিত তার সামনে। এই নিঃশব্দ সহানুভূতির মধ্যেও রাধের জীবনের কঠিন বাস্তবতা স্পষ্ট ছিল।

একদিন হারু সরাসরি কথাটা তুলল—

“তোর খুব কষ্টে দিন কাটে রাধে। ঠিকমতো তো পোলাপানদের মুখে কিছু দিতে পারিস না। পড়াইয়া আর কি হবে? তর দুই নাম্বার পোলাডারে আমার এখানে কাজ করতে দে। সকাল থেকে দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত থাকবে। এখানে কাজ করবে, খাওয়াও এখানেই পাইব। সকালে, দুপুরে, রাতে।”

রাধে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, “বয়স তো খুব বেশি হয় নাই। কাজে দিলে তো পড়াশুনাটা একেবারে গোল্লায় যাবে।”

হারু মিয়া একটু রাগের সুরে বলল, “যাক না গোল্লায়। পেট ভরতে না পারলে ইস্কুলে যাইব কেমনে? পোলার পেটে দুইটা দানাও না পড়লে পড়াশুনা কইরা কি লাভ?”

হারুর কথা শুনে রাধে শ্যামের মাথাটা নিচু হয়ে গেল। সে জানে হারুর কথা ভুল নয়, কিন্তু ছেলেটার ভবিষ্যৎ যে তার হাতের মুঠোয় কর্পুরের মতো উবে যাচ্ছে, তা ভাবতে তার বুকটা যেন আরও ভারী হয়ে উঠল।

Top of Form

Bottom of Form

একদিন রাধে শ্যাম সুবীরকে নিয়ে এল হারু মিয়ার দোকানে।

হারু মিয়া সুবীরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কি নাম তোমার, আব্বা?"

"সুবীর," মৃদু স্বরে জবাব দিলো ছেলেটা।

"মাশাল্লা! খুব সুন্দর নাম," হারু মিয়া প্রশংসা করে বললেন। যেন ছোট্ট ছেলেটার ভেতরে লুকানো কষ্টটা এক মুহূর্তের জন্য ভুলিয়ে দিতে চান। তারপর তিনি দোকানের ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু তার অভিজ্ঞ চোখ দেখে বুঝলেন, সুবীরের পেটে সকাল থেকে কিছুই পড়েনি।

ফিরে এসে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "সুবীর, সকালে থেইক্যা কিছু খাইছনি আব্বা?"

সুবীর মাথা নিচু করে একেবারে চুপচাপ উত্তর দিল, "না কাকা, কিছু খাইনি।"

হারু মিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু থেমে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে আব্বা, তুই ওই কোণাডাতে গিয়া বস। আমি তোকে একটু খিচুড়ি দেই। পেটে খাবার না পড়লে তো কাজ করতে পারবি না। আগে ভালো কইরা খাইয়া নে।"

সুবীর ধীরে ধীরে দোকানের কোণে গিয়ে বসলো, তার ক্ষুধার্ত শরীরে একরকম স্বস্তি নেমে এলো, আর চোখের কোণে একটা ক্ষীণ আশার আলো ফুটে উঠলো। হয়তো এই চায়ের দোকানে কাজ করাটা তার জীবনে নতুন একটা পথ খুলে দেবে—যেখানে অন্তত দু’বেলা পেট ভরে খেতে পারবে। শৈশবের স্বপ্নগুলো ফিকে হয়ে এলেও, অন্তত ক্ষুধার অন্ধকারটা দূরে সরে যাবে।

Top of Form

Bottom of Form

এদিকে, সঞ্জয়, বিকাশ তখনো ছোট।

তখন সঞ্জয় গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে যেত। স্কুলটা বাড়ির একদম কাছেই ছিল। শুভ্ররা সবাই ঐ স্কুলেই পড়াশুনা করেছে। কিন্তু সেই স্কুল বলতে যা বোঝায়, তা ছিল খুবই সাধারণ, দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। টিনের চালের একটি লম্বা ঘর ছিল মূল স্কুল বিল্ডিং, আর বেশিরভাগ ক্লাসই বসত খোলা আকাশের নিচে। স্কুলের মাঠে, গাছের তলায়। ছাত্ররা মাটিতে বসে পড়াশোনা করত, আর শিক্ষকরা চিৎকার করে পড়াতেন, যাতে সবাই শুনতে পায়।

স্কুলের অবস্থা এমন ছিল যে বৃষ্টির দিনে টিনের চাল থেকে পানি ঝরত, আর রোদেলা দিনে গরম টিনের নিচে বসা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তবুও, সেই অতি সাধারণ পরিবেশেও গ্রামের শিশুদের পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছা ছিল। খাতা-কলম ছিল সবার কাছে বিলাসিতা, পাটের তৈরি ঝোলানো ব্যাগ আর দু-একটা পুরনো বই নিয়েই চলত তাদের শিক্ষা।

স্বাধীনতার আগের সেই সময়ে, গ্রামের স্কুলগুলো ছিল এমনই—অভাব-অনটনের মাঝেও শিক্ষার আলো ছড়ানোর একটুকরো আশ্রয়, যেখানে সবকিছু সীমাবদ্ধ হলেও স্বপ্নগুলো ছিল বড়।

তবে গ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুটি ভবনই পাকা দালানের। গ্রামের পুরনো জমিদার, তারিণী চরণ লাহা, কয়েক যুগ আগে এই স্কুলটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে "তারিণী চরণ লাহা উচ্চ বিদ্যালয়"।

যুদ্ধের বছর দুয়েক আগেই শুভ্রর জন্ম হয়।

দারিদ্র্যের কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যেও শুভ্র যেন ছিল এক টুকরো আলোর ঝলক। ছোট্ট শুভ্রর কোলাহল, তার নিষ্পাপ হাসি আর পায়ের ছোট ছোট পদচারণা অরুন আর তার পরিবারের জীবনে এক অপূর্ব আনন্দ নিয়ে আসে। অরুন, যে দারিদ্র্যের কষ্ট আর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতো, শুভ্রর মুখে হাসি দেখলেই সব কষ্ট ভুলে যেত। তার ছোট্ট হাত ধরা আর মুখে মিষ্টি হাসি দেখলে অরুনের মনে হতো, পৃথিবীর সব অভাব-অনটন ভুলে থাকার মতো কিছু পেয়েছে সে।

অভাবের সংসারে বড় কিছু নেই। কিন্তু শুভ্রর সেই ছোট্ট হাসির মধ্যেই যেন ছিল সবার জন্য অমূল্য এক শান্তি, ভালোবাসা আর তৃপ্তি।

শুভ্রের বোন মীনাক্ষীকে যুদ্ধের আগেই ছোট কাকার কাছে পড়াশুনার জন্য পাঠানো হয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে ঘরের কাজে লেগে পড়ে। রান্না ঘরই যেন তার নতুন পাঠশালা হয়ে ওঠে। এই ছোট্ট বয়সেই যেন মেনে নিয়েছে যে আর কোনোদিন হয়তো বইয়ের পাতাগুলো স্পর্শ করতে পারবে না। তার ছোট্ট জীবন থেকে স্বপ্নগুলো এক এক করে মুছে যেতে লাগল, ঠিক যেমন ঝরে পড়ে শুকনো পাতা। আনন্দের জায়গায় বেদনার ভারে সবকিছু নীরব, নিস্তব্ধ। তার জীবনের রঙিন স্বপ্নগুলোও ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, যেন কোনোদিন আসলেই সেগুলো ছিল না—শুধু ফাঁকা, শূন্যতা আর অসহ্য কষ্টের একটা দীর্ঘশ্বাস।

এমনই এক মর্মান্তিক, বেদনায় ভরা জীবন কাটছিল শুভ্রদের।

গরীব বাবার পক্ষে এই অসহনীয় দারিদ্রতা ছিল এক অসহ্য যন্ত্রণার। ক্ষুধার্ত, উদাসীন, ফ্যাকাসে ছোট ছোট সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সন্তানদের খালি পেটে কাতরাতে দেখে বুকের ভেতর থেকে যেন প্রাণটা একেকবার ছিঁড়ে যেত। কত চেষ্টা করেও সে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত না। প্রতিবারই আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়ত।

অরুণের মা, কোনোদিন মুখে কিছু না বললেও, ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ত। প্রতিটি রাত ছিল তার জন্য দীর্ঘ, কষ্টে ভরা। নিঃশব্দে, চোখের জল ফেলত এবং বারবার ঈশ্বরের কাছে হাত তুলে বলত, `ঠাকুর, আর পারছি না, একটু দয়া করো।" মাথা ঠুকে কেঁদে ভেঙে পড়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। কত রাত সে এই প্রার্থনা করেছে, কিন্তু তার কোনো উত্তর আসে নি—শুধু কষ্ট, বেদনা আর হতাশার ঘন অন্ধকার তার চারপাশে ঢেকে থাকত। অনাহারে, অর্ধাহারে থেকেও, নিজের ক্ষুধা ভুলে, সন্তানের মুখে শেষ খাবারটুকু তুলে দেওয়ার সময়ও তার মুখে হাসি থাকত এক রাশ। কিন্তু সেই হাসির পেছনে লুকিয়ে থাকত অসীম কষ্ট আর অপ্রকাশিত যন্ত্রণা।

এই অভাব-অনটনের মধ্যেও, তারা একে অপরকে ভালোবাসত। সামান্য যা ছিল, তাই দিয়ে পরস্পরকে আগলে রাখত। যেন এই ভালোবাসাটুকুই তাদের জীবনের শেষ অবলম্বন, শেষ আশ্রয়।

অরুনের ছোট বোন মীনাক্ষীর তখন বয়স মাত্র সাত-আট বছর। তার তিন বছরের ছোট সঞ্জয়। সঞ্জয় তখন গ্রামের স্কুলে যায়। স্লেট-আর পুরনো আদর্শলিপি বগলে চেপে প্রতিদিন গাছতলায় বসে পড়ত। ইট দিয়ে ছোট্ট একটা টেবিল বানিয়ে খড়ি দিয়ে লেখালেখির কাজ করত। বিকাশ তখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি। তবে সঞ্জয় দাদাকে স্কুলে যেতে দেখলে সেও যেতে চাইত। সঞ্জয়ের স্কুলে যাওয়া দেখে বিকাশেরও ইচ্ছে হয়, একদিন সেও দাদার মতো স্কুলে যাবে।

অরুণ ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অসম্ভব মনোযোগী ছিল, আর তার মেধাও ছিল ঈর্ষণীয়। স্কুলে সবসময়ই ভালো রেজাল্ট করত। শিক্ষক-সহপাঠীরা তাকে নিয়ে গর্ব করত। যুদ্ধ শুরুর বছর খানেক আগেই সে এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য কঠোরভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরীক্ষার আগে পড়াশোনায় এতটাই মনোযোগী হয়ে পড়ে যে দিন-রাত এক করে দিত। রাত জেগে বইয়ে ডুবে থাকত, আবার ভোরের আলো ফোটার আগেই, সবার চোখে ঘুম থাকতেই, হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসত। সে তখন দিদির বাড়িতে থাকত, যেন পড়াশোনায় কোনো বিঘ্ন না ঘটে। এই কারণে নিজের বাড়িতেও দীর্ঘদিন আসেনি।

অতিরিক্ত রাতজাগা আর অবিরাম পরিশ্রমের ফলে পরীক্ষার মাত্র দু’দিন আগে অরুণ হঠাৎ ভয়ানক কালো জ্বরে আক্রান্ত হয়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, আর সাথে শুরু হয় বমি। অরুণের অসুস্থতার খবর শুনে পরিবারের সবাই গভীর চিন্তায় পড়ে যায়, বিশেষ করে তার মা-বাবা। সন্তানের এই অসুস্থতা তাদের দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। তড়িঘড়ি করে মা-বাবা অরুণকে দিদির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে, যেন তার সেবা করতে পারে এবং যত্ন নিতে পারে।

মা প্রতিদিন অরুনের পাশে বসে তার কপালে জলপট্টি দিত। একদিন মা তাকে বলল, "অরুন, তোর শরীর ঠিক নাই রে, পরীক্ষা দিস না বাবা। সামনের বছরও তো পরীক্ষা দিতে পারবি।"

অরুন উত্তরে বলল, “না মা, তা হয় না। আমি এই বছরই পরীক্ষা দিমু। এতদিন খাইট্যা পড়াশুনা করলাম, পরীক্ষা না দিলে আমার সব পরিশ্রমটা মাটি হইয়া যাইব। আমি পারমু, তুমি চিন্তা কইরো না।"

বাবা তখন ভেতরে এসে বললেন, “শরীরই যদি ভালো না থাকে, তাহলে পরীক্ষা দিয়ে কী লাভ বল? আগে সুস্থ হও, তারপর পরীক্ষা দিস।”

অরুন একটু হেসে বলল, “বাবা, পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক, আমি শুধু চেষ্টাটুকু করতে চাই। আমি যদি পরীক্ষা না দিই, তবে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না।”

পরিবারের সবাই তখন খুবই চিন্তিত ছিল, কিন্তু তারা জানত, অরুনকে বাধা দেওয়া মানে তার মনোবল একেবারে ভেঙে দেওয়া। পরীক্ষার দিন সকালে, জ্বর নিয়েই অরুন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হলো। মায়ের চোখে জল টলমল করছিল, কিন্তু মনের গভীরে সে একটা আশার আলো ধরে রাখল—তার ছেলে ঠিকই পরীক্ষাটা দিতে পারবে। বাবা তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, “তুই অনেক সাহসী ছেলে রে, কিন্তু যদি পরীক্ষার মাঝখানে শরীরটা খুব খারাপ লাগে, তা হলে জেদ করিস না, বাড়ি চলে আসিছ।”

অরুন মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। স্কুলে পৌঁছে সে ধীরে ধীরে পরীক্ষার ঘরে ঢুকল।

অরুণ যখন পরীক্ষার ঘরে বসে একাগ্রতার সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর লিখছিল, বাইরে প্রকৃতি যেন তার সংগ্রামের সাথী হয়ে উঠেছিল। আকাশটা ছিল মেঘে ঢাকা, হালকা ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল, আর গাছের পাতারা গুঞ্জন তুলছিল। দূরের আমগাছের শাখাগুলো ধীরে ধীরে দুলছিল, যেন প্রকৃতির নিঃশব্দ প্রার্থনা অরুণের জন্য। আকাশে সূর্য লুকিয়ে ছিল, কিন্তু মনের ভেতর অরুণের ছিল এক অদম্য আলো—তার স্বপ্ন পূরণের, নিজেকে প্রমাণ করার।

বাতাসে এক ধরনের অদ্ভুত শান্তি ছিল, কিন্তু সেই শান্তির মাঝেই লুকিয়ে ছিল অরুণের হৃদয়ের তীব্র যুদ্ধ। তার হাতের কলম বারবার থমকে যাচ্ছিল, চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছিল, তবুও সে থামছিল না। প্রতিটি উত্তরের সাথে যেন তার জীবনের প্রতিটি স্বপ্নের চিহ্ন আঁকা হচ্ছিল। প্রতিটি শব্দের ভেতর সে তার ভবিষ্যতের রং দেখছিল—একদিন এই পরীক্ষার ফলাফলই তাকে নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যাবে, তার জীবনের সব চেষ্টার মূল্য দেবে।

পরীক্ষার ঘরের বাইরে, দূর আকাশে মেঘের ফাঁকে একটু একটু করে সূর্যের কিরণ ফুটে উঠছিল, যেমনভাবে অরুণের মনের গভীরে তার স্বপ্নের আলো জ্বলছিল। গাছের পাতাগুলো যেন তাকে সাহস দিচ্ছিল, বাতাস তার কানে ফিসফিস করে বলছিল, "তুই পারবি, তুই জিতবি।" অরুণের হৃদয়ে তখন একটাই চিন্তা—যত কষ্টই হোক, সে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে লড়াই করে যাবে।

**চলবে--- পর্ব ৩)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট

Bottom of Form